পরশুরামের গল্পে সময়ের মাত্রা (প্রবন্ধ)

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পরশুরাম গল্প লিখতে শুরু করেন ১৯২২-এ (''শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'') আর শেষ গল্প বেরয় ১৯৫৯-এ (গুপী সাহেব'')। মধ্যে কয়েক বছর তিনি কোনো গল্প লেখেন নি। এই আটতিরিশ বছরের মধ্যে বাঙলার ইতিহাসে অনেক কিছু ঘটে গেছে, ইংরেজ বিদায় নিয়েছে, শিক্ষা, বিশেষ করে নারীশিক্ষার ও স্বাধীনতার এলাকা বেড়েছে, দেশের মানুষের চালচলন, হাবভাব, ভাবনাচিন্তার ধরণধারণ অনেকটাই বদলে গেছে। কম্পানি আইনের কড়াকড়ি যখন ছিল না একমাত্র তখনই ''শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'' লেখা যেত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কালোবাজারের তেমন রমরমা ছিল না। ''তিন বিধাতা'' বা ''লক্ষ্মীর বাহন'' -এর মতো গল্প তাই ১৯৩৯-এর আগে আশা করা যায় না। বহুবিবাহ রদ হওয়ার ফলেই ত্রিক্রমদাস করোড়ী অমন মুশকিলে পড়েন (''আনন্দীবাঈ'')। সমাজ-সংসারের এমন সতত পরিবর্তমান সব ঘটনাই পরশুরামের গল্পর পটভূমি।

সব রচনারই দেশ - কাল এর মাত্রা থাকে; কোনো বিশেষ জায়গায় বিশেষ সময়ে ঘটনা ও চরিত্রদের দেখানো হয়। কিন্তু সব লেখকই সময় সম্পর্কে সচেতন থাকেন না। পরশুরামের গল্পে সেই সচেতনতা খুব বেশি করে চোখে পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে- সব পরিবর্তন হয়ে চলেছে তার নিশানাও তিনি দিয়ে রাখেন। কিছু গল্পে তো কোনো বিশেষ সময়কেই কেন্দ্রে রাখা হয়। একেই বলছি ''সময়ের মাত্রা''। যেমন, ১৯৮৭ -এর আগে পরশুরামকে রাষ্ট্র পরিচালনা নিয়ে ভাবতে হয় নি। ইংরেজ আমল সম্বন্ধে কিছু ঠাট্টা অবশ্যই আছে (''মহাবিদ্যা'', ''উলট পুরাণ'')। তবু ছোটোলাটের আইন পরিষদ (কাউন্সিল) নির্বাচন ছাড়া আর কোনো বড় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ তাঁর গোড়ার দিকের গল্পে আসে না। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে সমসময়ের ঘটনাগুলি তিনি ছুঁয়ে যান। যেমন, ''দক্ষিণরায'' - এর গোড়ায় আসে রাউলাট রিপোর্ট' (১৯১৮)-এর কথা; স্বরাজ, স্বদেশী, ...চরকা, কাউন্সিল ভাঙা, ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়ে না। ''লম্বকর্ণ'' (কার্তিক ১৩৩৯য় জানা গিয়েছিল : বংশলোচনবাবু আর সেই বিখ্যাত পাঁঠার ''বড় একটা খোঁজ খবর করেন না, তিনি এখন [কাউন্সিল] ইলেকশন লইয়া ব্যস্ত।'' এ হলো ১৯২৩ -এর নির্বাচন। দাঁড়ানোর দুর্মতি হলো তার কারণও সর্বজ্ঞ চাটুজ্যে মশায় বলে দেন:

বকুবাবু যেদিন পঞ্চাশ বৎসরে পড়লেন সেই রাত্রে বঙ্গমাতা তাকে বলেন— বৎস বকু, বয়স তো ঢের হ'ল টাকাও বিস্তর জমিয়েছ। কিন্তু দেশের কাজ কি করলে? বকুলাল জবার দিলেন— মা, আমি অধম সন্তান, বক্তৃতা দেওয়া আসে না, ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশে যেতে পারি না, খদ্দর আমার সয় না, সুখের শরীর— দেশী মিলের ধুতিতেই পেট কেটে যায়। আর বোমা দূরে থাক, একটা ভুঁই-পটকা ভুঁই ছোঁড়বার সাহসও আমার নেই। কি কর্তব্য তুমিই বাতলে দাও। খাটুনির কাজ আর এ বয়সে পেরে উঠব না। সোজা যদি কিছু থাকে তাই ব'লে দাও মা। বঙ্গমাতা বললেন—কাউনসিলে ঢুকে পড়।

কে এই বঙ্গমাতা? বকুবাবুর বয়ানে পরশুরাম জানান: ইনি ''সত্যিকারের দেবতা নন— বঙ্কিম চাটুজ্যের হাতে গড়া। তাঁর কোনো যোগ্যতা নেই কেবল লোককে খেপিয়ে দিতে পারেন।''

কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে তখন কী কাণ্ড হতো তার বিররণ আছে এই গল্পে। বকুলালের পুরনো শত্রু রামজাদুবাবুও সোঁদরবন কেন্দ্রেরই প্রার্থী, তিনি ''রাতারাতি খদ্দরের সুট বানিয়ে

সৃষ্টিসন্ধান

বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন" (সুট কথাটা খেয়াল করার মতো। খদ্দর থেকে বোঝা যায় তিনি কংগ্রেস স্বরাজ্য দলের প্রার্থী)। তাতে ''বকুবাবুর দ্বিগুণ রোখ চেপে গেল— তিনি টেরিটি বাজার থেকে একটি তিন নম্বরের টিকি কিনে ফেললেন, দেউড়িতে গোটা দুই ষাঁড় বাঁধলেন আর বাড়ির রেলিং-এর ওপর ঘুঁটে দেওয়া যায়— সে অবশ্য এক সমস্যা। তবে ''তিন নম্বরের টিকি" মানে নিশ্চয়ই বেশ মোটাসোটা টিকি, মাথার পেছনে আটকানোরও ব্যবস্থা আছে। আর দেউড়িতে ষাঁড় বেঁধে রাখার একটাই কারণ থাকতে পারে : বকুবাবু প্রমান করতে চান তিনি ঘোরতর হিন্দু।

কাউন্‌সিল নির্বাচন নিয়ে খবরের কাগজে কত রকম কেচ্ছা - কেলেঙ্কারি খবর বেরুত আরও কিছু নমুনা পরশুরাম দিয়েছেন। আইন বাঁচিয়ে মানহানির কেমন চতুর চেষ্টা: ''হে দেশবাসীগন, বকুলাল অত সোডা ওআটার কেনে কেন? কিসের সঙ্গে মিশিয়ে খায়?" ইত্যাদি। চাটুজ্যে মশায় জানান : ''বকুবাবুও পাল্‌টা জবাব ছাপতে লাগলেন, কিন্তু (ইংরিজিতে এদের বলে লিটারারি বুলি', literary bully)।

''দাক্ষিণরায়" -এর মূল ঘটনাই এই কাউন্‌সিল নির্বাচন। কিন্তু অন্যান্য গল্পেও সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা ওঠে। আর্মস অ্যাক্ট ও স্বদেশীর ডাকাতির কথা এসেছে ''রাতারাতি" গল্পে। ''কচি-সংসদ"-এ ''হিরে-বসানো চরকা ব্রোচ" নিয়ে বিদ্রূপটিও অসাধারণ।

''গুরুবিদ্যা"য় -এ দেখা যায়: মানিনী দেবীর মন্ত্র নেওয়ার শখ নিয়ে বংশলোচনবাবু খুবই দুশ্চিন্তিত। তবে তাঁর ভরসা একটাই : ''যদি দেশের বর্তমান হজুগের বশে তাঁহার (মানিনী দেবীর) পিকেটিং করিবার বা প্রভাত ফেরি গাহিবার ঝোঁক হইত তবে বংশলোচনের মান - ইজ্জত অনারারি হ্যাকিমি কোথায় থাকিত? তাঁহার মুরুব্বী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই বা কি বলিতেন? মেটের ওপর দেশভক্তির চেয়ে গুরুভক্তিতে ঝঞ্ঝাট ঢের কম।" ১৯৩০ -এই আইন অমান্য আন্দোলন তাহলে এই গল্পর পটভূমি।

১৯৪৭-এর পরে সাংবাদিকতা কী চেহারা নিয়েছিল, নতুন যুগের রাজনৈতিক নেতারা কোন্ কিসিমের লোক ছিলেন তার চমৎকার ছবি আছে ''বদন চৌধুরীর শোকসভা" -য়। শুধু বাঙলা বা ভারত নয়, গোটা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়েই পরশুরাম খুব চিন্তিত। ''গামানুষ জাতির কথা"-য় যে রসিকতা আছে তা খুবই কষা, ব্ল্যাকহিউমার। ''মাঙ্গলিক" এও তা-ই। ''রামরাজ্য", ''শোনা কথা", ''সত্যসন্ধ বিনায়ক", ''মাৎস্যন্যায়" ইত্যাদি গল্পে ধরা পড়েছে রাজনৈতিক জীবনের অবক্ষয়ের কাহিনী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কত রকমের অদলবদল হয়ে চলেছে তার সম্পর্কে পরশুরাম সর্বদাই সজাগ। তাঁর গল্পগুলির দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়।

কথাসাহিত্যে সমকালের চেহারা ফুটবে—এ তো জানা কথা। প্রশ্ন হলো: সময়ের মাত্রাকে পরশুরাম ধরেছেন কীভাবে। এর জন্য তাঁকে বেছে নিতে হয়েছিল একাধিক কালাকৌশল। এক এক করে সেগুলো দেখা যাক।

> দু-পুরুষের মধ্যেই কত তফাত হয়ে যায় তা ধরা পড়ে চাটুজ্যে মশায়ের কথা: আমরা ছেলেবেলায় বাপ-জ্যাঠার গালাগাল বিস্তর খেয়েছি, শোনা পারা মুখ ক'রে সমস্ত সয়েছি। কিন্তু সেদিন আর নেই মশাই। তখন এই কলকাতায় ঘোড়ার ট্রাম চলত ছেলেরা গোঁফ রাখত, কোটের ওপর উড়নি ওড়াত, মেয়েরা নোলক পরত আর নাইবার ঘরে লুকিয়ে গান গাইত, গবরমেন্টকে লোকে তখন বলত সদাশয় সরকার বাহাদুর। (''রাতারাতি")

অতীত আর বর্তমানের তুলনা হলো সময়ের মাত্রাকে ধরার ভালো উপায়। এর জন্যে পরশুরাম বেছে নিয়েছেন এক বিশেষ ধরণের আঙ্গিক। এক কথায় তাকে বলা যায়: একের -

সৃষ্টিসন্ধান

ভেতরে - দুই গল্প। এ ধরনের গল্পে গোড়ায় একটা কাঠামো কাহিনী থাকে, আর তার ভেতরে থাকে আরও একটি নিটোল কিন্তু ছোটো গল্প। কথনতত্ত্বর পরিভাষায় প্রথমটিকে বলে ফ্রেম বা ম্যাট্রিক্স ন্যারেটিভ আর দ্বিতীয়টিকে এম্‌বেডেড ন্যারিটিভ। বহু ক্ষেত্রেই এই ভেতরের গল্পটিই আসল গল্প। স্বভাবতই ঐ আসল গল্প ঘটনাকাল অতীত, আর কাঠামো কাহিনীর কাল বর্তমান। সময়ের এই ব্যবধানকে পরশুরাম কাজে লাগান দুই যুগের বাঙালির তফাত বোঝাতে। এর একটা দৃষ্টান্ত দেওযা যাক। চাটুজ্যে মশায় বলেন :

তখন রাজনীতি চর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্নচিন্তাও এমন চমৎকার হয় নি, দু-একটা পাশ করতে পারলে যেমন - তেমন চাকরি জুটে যেত। লোকের তাই উঁচুদরের বিষয় আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা করত— বউ ভালবাসে কি বাসে না। যাদের সে সন্দেহ মিটে গেছে তারা মাথা ঘামাত— ভগবান আছেন কি নেই (''মহেশের মহাযাত্রা'')

কথাগুলো লেখা হয়েছিল ১৯৩১-এ। আর চাটুজ্যে মশায় বলেছেন তার তিরিশ - চল্লিশ বছর আগের কথা। তখনও ছোটোলাটের কাউন্‌সিল-এর সরাসরি নির্বাচিত সদস্য ছিল না। বঙ্গভঙ্গ নিয়ে স্বদেশী আন্দোলন হয় নি, মর্লিমিন্টো (১৯১০) ও মন্টেগু - চেমস্‌ফোর্ড (১৯১৮) সংস্কার দূর অস্ত। সেই সংস্কার হওয়ার পর শুধু বংশলোচনবাবু বা বকুবাবুই নন, শহর ও গ্রামের অনেক লোকই ''রাজনীতি'' চর্চায় নেমে পড়েন। ফলে উচুঁদরের সব বিষয়— সে বৌ-এর ভালোবাসাই হোক আর ভগবানের থাকা না - থাকাই হোক— পেছনে পড়ে যায়।

বংশলোচনেবাবুর বৈঠকখানায় ''নিত্য বহুসংখ্যক রাজা - উজির বধ হইয়াছে।'' পরমার্থতত্ব, প্রতিবেশী অধরবুড়োর শ্রাদ্ধ, আলিপুরের নতুন কুমির, বাঘ— কোনো প্রসঙ্গই বাদ যায় না। কিন্তু তার সঙ্গে এসে জোটে ''লাটসাহেব, সুরেন বাঁড়ুজ্যে, মোহনবাগান'' এর কথা।'' দক্ষিণরায়ের গল্প শুরু করার আগেই চাটুজ্যে মশায় দরজা, জানলায় উঁকি মেরে দেখে নেন: পুলিশের গোয়েন্দা হরেন ঘোষালটা হঠাৎ যেন এসে না পড়ে। আর বংশলোচন একটা ভয় পেয়ে বলেন : ''ওসব ব্যাপার নাই বা আলোচনা করলেন। হাকিমের বাড়ি ওরকম গল্প -না হওয়াই ভাল।'' শেষে রফা হল : চাটুজ্যে মশায় ''বেশী সিডিশাস'' কথাগুলো বাদ দিয়ে বলবেন।

এ তো গেল রাজনীতির কথা। আরও অতীতের বাঙালি আর বর্তমানের বাঙালির তফাত দেখানোর জন্যে পরশুরাম অন্য একটা কৌশল বেছে নেন। সেটি হলো পুনর্জন্ম পরশুরাম নিজে অবশ্য সংস্কারমুক্ত মানুষ ছিলেন । জন্মান্তর''-এ। ১৮৭৮ শক অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬-য় লেখা এই গল্পর গোড়াতেই বলা যায়:

প্রায় দেড়শ বৎসর আগেকার কথা। তখন কলকাতায় বাঙালী হিন্দু সমাজের নানারকম পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে কিন্তু তার কোনও লক্ষণ রাঘবপুর গ্রামে দেখা দেয় নি। কাশীনাথ সার্বভৌম সেই গ্রামের সমাজপতি, দিগ্‌গজ পণ্ডিত, যেমন তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান তেমনি বিষয়বুদ্ধি।

এই মহাত্মাটি ''জমিদারি দেখেন, তেজারতি আর দেবসেবার সহাবস্থান নজর করার মতো)। ''কলকাতার কিরিস্তানী অনাচার'' তাঁর গ্রামে যাতে না ঢোকে সে-ব্যাপারেও তিনি অনড়।

গল্পটি এখানে আর বিস্তৃতভাবে বলার দরকার নেই। দেড়শ বছরে বাঙালির হালচাল কত বদলে গেছে— সেটা দেখানোই ছিল পরশুরামের উদ্দেশ্য। কাশীনাথ দুঃখ করে বলেন:

সৃষ্টিসন্ধান

পৃথিবীতে কলি যে এত প্রবল হয়েছে তা তো ভাবতে পারি নি। ব্রাহ্মণের বাড়ি বাবুটি রাঁধছে মুরগি চরছে, বুড়ী মাগীরা জুতো পরে গটমাটিয়ে চলছে, ধাড়ী মেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। ছোট লোকেরা আস্পর্ধা বেড়ে গেছে, ব্রাহ্মণকে গ্রাহ্য করে না, সামনেই বিড়ি খায়। এখনে আর ধর্ম কিছু রক্ষা পাবে না।

পরশুরাম কি তার জন্যে দুঃখিত মোটেই না। বরং কাশীনাথের মতো লোক যে হাস্যকর ও অচল এ গল্পে সেটাই দেখানো থাকে।

পুনর্জন্মর আশ্রয় না নিয়েও, এক শতায়ু মানুষের জন্মজয়ন্তীকে উপলক্ষ্য করে সময়ের মাত্রাকে পরশুরাম অন্যভাবে ধরেন (''জয়রাম জয়ন্তী'') জযরাম নন্দী অবশ্য কোনো উঁচু কেতার লোক নন। এক বিলিতি ফার্ম -এ তিনি চল্লিশ বছর চাকরি করেছিলেন, শেষ বিশ বছর তিনি বড়বাবু। তিনি অবসর নেওয়ার পর পুরুষানুক্রমে তাঁর ছেলে ও নাতি ঐ কম্পানিতেই কাজ করছে। ছেলেও যথাকালে বড়বাবু হয়েছিলেন, নাতিও বড়বাবু হবেন বলে আশা করা যায়। শুধু সিম্পসন স্মিথ অ্যাণ্ড কম্পানির মালিকদের প্রতি নয়, গোটা বলে আশা করা যায়। শুধু সিম্পসন স্মিথ অ্যাণ্ড কম্পানির মালিকদের প্রতিই নয়, গোটা ইংরেজ জাতির প্রতিই জয়রামর অগাধ ভক্তি। দেশ যে স্বাধীন হয়েছে সে-কথা অনেক সময়েই তিনি ভুলে যান। যখন খেয়াল হয় তখনও তিনি ব্রিটিশ আমলকেই পছন্দ করেন। দুই আমলের তফাতটাও ধরা পরে তাঁর কথায়। কম্পানির বড় সাহেব হ্যারি সিম্পসনকে জয়রাম বলেন:

ব্রিটিশ আমলে আমাদের ছেলে ভাইপো শালা জামাই-এর চাকরি জোটনো সহজ ছিল কারণ আপনাদের আত্মীয়রা কেউ তুচ্ছ কেরানির কাজ চাইতেন না। কিন্তু এখন একটা সামান্য পোস্টের জন্যে বড় বড় কর্তারা সুপারিশ পাঠান, তাঁদেরও এক পাল বেকার আত্মীয় আছে কিনা।

এইভাবে নানা কলাকৌশলে পরশুরাম তাঁর গল্পে সময়ের মাত্রাকে ধরে রাখেন। যুগের পরিবর্তন মানে কোনো বিমূর্ত ব্যাপার নয়; সমাজ সংসার রাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদি পরিবর্তনকেই যুগের পরিবর্তন বলে দেখানো হয়। সচেতনভাবে পরশুরাম একই দেশে নানা সময়ের ছবি তুলে ধরেন আশ্চর্য দক্ষতায়। শুধুই হাসির গল্প হিসেবে পড়লে তাঁর প্রতিভার এই দিকটি আড়ালে থেকে যায়।

সৃষ্টিসন্ধান